***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 63-71*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# বাংলা প্রতিবাদী নাটকের উদ্ভবযুগ: মধুসূদনের প্রহসন

**ড. অনল বিশ্বাস**
*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract***

*Michael Madhusudan Dutta became most successful playwright among others to westernisation of Bengali theatre. 'Krishnakumari' is considered as his greatest play, gave him huge honour by its dual characteristics as it revealed the playwright's keen interest on historical drama as well as establishment of tragedy. But Madhusudan bagged his permanent position in world literature by his two farces, 'Ekei ki bole sabhyata' and 'Buro shalikher ghare roun'. These plays show firstly exaggeration of external celebration of hyper modernisation of neo-literate youth of Bengal and on the other side debauchery of so-called religious leaders and Jamindar.*

*Though the main purpose of the play 'Ekei ki bole sabhyata' was to show the bad effect of alcoholism, but Madhusudan didn't use any propagandist technique to achieve his goal rather depended upon the dramatic action only. His strategic self control uplifts this farce from the bad essence of 'purposeful drama'.*

*'Ekei ki bole sabhyata' and 'Buro shalikher ghare roun' both the plays were written in the same year and theme of those also very closed in nature. Actually they are made for each other even can be called they are two sides of same coin. They gave crystal clear picture of drunkenness of 'Young Bengal' and dissipation of Jamindar. The plays upholds the protesting feature not by loud slogan but by sharp theatrical language. In natural consequences both the plays didn't get the necessary permission for performance before the audience for second time. Belgachia Natyashala couldn't keep their commitment to make use their stage for this production. This is the first production which was stopped under pressure. This incident honoured the two farces and their creator.*

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই চলতি সমাজব্যবস্থা ক্রমশ তার স্থিরতা হারাতে থাকে। কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নব্যবাবুদের বিলাসিতার উদ্ভব চিত্র উৎকটভাবে সামনে আসতে থাকে। সমাজকে বের করে আনার জন্য রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-দেব যেমন পেয়েছি, তেমনি সমাজকে আলোর দিশা দেখাতে নাট্যকারদের প্রয়াসের বিষয়টিও সামনে আনতেই হয়। যদিও উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা নাটকের কোন আদর্শ না থাকায় ইংরেজি ও সংস্কৃত আদর্শে বাংলা নাটকের স্কেচ্ বা নক্সা মূলক রচনা চলতে থাকে প্রায় প্রথম পঞ্চাশ বছর। এই নক্সা জাতীয় রচনার মধ্যে দিয়েই সমাজের প্রতিচ্ছবি যেমন সামনে এসেছে, তেমনি সে ছবির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে সমাজের প্রকৃত অবস্থার চিত্রও ফুটে উঠেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকারদের হাতে এই প্রচেষ্টার

সফল প্রয়াস আমরা পেলাম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কৌলিন্য প্রথার ফলশ্রুতিতে বাংলার বহুপরিবারের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। একদিকে বাল্য বিধবা- অন্যদিকে বিবাহের পর স্বামী-ঘরের পরিবর্তে বাপের বাড়িতে আবাল্য বসবাস, সমস্ত কিছু মিলিয়ে সমাজে ব্যাভিচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজের এই অমানবিক অনাচারে ঘুলিয়ে ওঠার কালে কলম ধরলেন নাট্যকারেরা। নাট্যকারেরা সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন গোটা সমাজের প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখা গেল তাঁদের। সমসময়ের আমরা হয়তো মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে উঠতে দেখিনা অথবা শুনতে পাই না, গণকণ্ঠের অমোঘ গর্জন, কিন্তু নাট্যকারেরা খুবই সচেতন-শান্ত- অথচ দৃঢ় ভাবে বিষয়গুলি তাদের সামাজিক নাটকের মধ্যে তুলে ধরে সমাজের ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পেরেছিল। তাই প্রতিবাদের প্রতিভূ হয়ে সামনে আসা সামাজিক নাটকগুলো হয়ে থাকল বাংলা নাটকে প্রতিবাদের প্রথম প্রস্তাব।

সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন আন্দোলনকে আবর্তন করে তৎকালীন সমাজ এগিয়ে যেতে থাকে। নাটক মূলতঃ সমাজেরই মঞ্চচিত্র তাই এর প্রভাব বাংলা নাটকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে পড়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই তাদের নাটকের মাধ্যমে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বলেন। প্রথমেই উমেশচন্দ্র মিত্র তাঁর; বিধবা বিবাহ নাটক'- এর মধ্যে দিয়ে সমাজের বুকে শেল বর্ষণ করেন এবং করুণরসের স্রোতে সমাজের জগদ্দল পাথরটাতে কিছুটা হলেও চিড় ধরাতে পেরেছিলেন। এরপরে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চপলাচিত্ত চাপল্য' নাটকখানির মধ্যে দিয়ে বিষয়টিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান।

এর পরেই আসে বহু বিবাহ। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে সেকালে বেশ কিছু নাটকধর্মী স্কেচ রচিত হয়েছিল যা, তৎকালীন নাট্যকারদের দুঃসাহসের পরিচয় দেয়; তাঁদের প্রতিবাদ সামাজিক সমস্যা ও কু-প্রথার বিরুদ্ধে। এই শ্রেণির নাটকের মধ্যে 'কীর্তিবিলাস', মনমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা', দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একই সঙ্গে 'বাল্যবিবাহ নাটক', রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ' এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ' নাটক ইত্যাদি। এই সকল নাটকের মধ্যে নাট্যশিল্প অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য যে প্রবল ছিল, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। অন্ততঃ নাটক পাঠ করলে তাই মনে হয়। শিমুয়েল পিরবক্সের 'বিধবাবিবাহ' নাটকে মনোমোহিনী, হাড়ীর ছেলে নঙ্গরার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। লজ্জায় দুঃখে তার বাবা ও মা ঘর ছেড়ে যাবার আগে একটি চিঠি লিখে রেখে যায়। যাতে লেখা ছিল-

> *'হে দেববংশ হিন্দু লোকেরা তোমরা আমার স্বজাতীয় লোক, সেইজন্যেই তোমাদের নিকটে আমার নিবেদন এই, যদি কুলশীল জাতি মানরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে শীঘ্র যাহাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয় এমন চেষ্টা কর।'*[১]

মূলতঃ এই তথ্য সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা। এই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই নাট্যকারদের উদ্দেশ্যমূলক নাটক রচনা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সাহিত্যিক প্রবর্তনায় যে নাটকগুলি সামনে এসেছে তাতে প্রতিবাদের দিকটি প্রস্ফূটিত হয়নি পাশাপাশি বাংলা নাটকের সূচনালগ্নে সামাজিক প্রবর্তনায় যে নাটকগুলি লেখা হয়েছে, তাতেই ধরা পড়েছে বাংলা নাটক প্রথম প্রতিবাদী ভাষা। আর - এ বিষয় যে নামটি প্রথম আমাদের মনে পড়বে সেটি রামনারায়ণ তর্করত্ন তথা নাটুকে রামনারায়ণ। ১৮৫৪ থেকে ১৮৭৫ - এই সময়কালের মধ্যে নাটক লিখেছেন রামনারায়ণ। তার প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' আর শেষ নাটকটি 'ধর্মবিজয়'। এই সময়ের

মধ্যবর্তী কালে বাংলায় উমেশ্চন্দ্র মিত্র এবং মীর মশাররফ হোসেন নাটক রচনা করেছেন; আবার এই সময়কালেই উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তো বটেই সর্বকালের বাংলা প্রতিবাদী নাটকের মধ্যে অন্যতম নীলদর্পনের লেখক দীনবন্ধু মিত্রও নাটক রচনা করেছেন।

এই সামাজিক প্রবর্তনার হাত ধরেই নাট্য উৎকর্ষের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলেন মধুসূদন। নাট্যবোদ্ধারা তাঁকে বাংলা নাটকের নবযুগের দারোদ্ঘাটক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক – শর্মিষ্টা (১৮৫৯)। তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি এরকম – পদ্মাবতী (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) এবং মায়াকানন (১৮৭৪)। নাটকে পাশ্চাত্য রীতির সফল প্রয়োগে মধুসূদন দত্ত, তারাচরণ শিকদার বা জি. সি. গুপ্তকে ছাড়িয়ে গেলেন একথা বলাই বাহুল্য, তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক – কৃষ্ণ কুমারী- একদিকে ঐতিহাসিক নাটকের প্রবর্তনায় অন্যদিকে ট্রাজেডির প্রতিষ্ঠা, মধুসূদনকে অনেকখানি মর্যদা দেবে একথাও সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু সামাজিক প্রবর্তনায় যে দুখানি নাটক (প্রহসন) মধুসূদনকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান করে দেবে তা হল- 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। একদিকে নব্য শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের অতি-সংস্কারমুক্তির বাহ্য-আড়ম্বরের অতিশয্য অপরদিকে ধর্মাধিকারী জমিদারদের লাম্পট্য এবং শুচিবাইগ্রস্ততার নির্মেঘ প্রকাশ – পাঠক, দর্শককে চমৎকৃত করে।

> *"মধুসূদনের মায়া-কানন' সহ চারখানি নাটকই রোমান্টিক, বাঙালি জীবনের সঙ্গে ইহাদের কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। ... তবে প্রহসন দুখানির মধ্যে বাঙালী সমাজের বিশেষ বিশেষ কোন কোনও অংশের বাস্তব রূপ নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"*[২]

এই মতামতটি অনুধাবন করলে বর্তমান আলোচনার শুধুমাত্র মধুসূদনের প্রহসন দুটির বিচারই যথেষ্ট সেই প্রতীতিতে উপনীত হওয়া সহজ হয়। যাইহোক, আমরা দেখেছি রামনারায়ণের রচনায় (যে বিষয়গুলির) সরাসরি প্রতিবাদ করা হয়েছে, তার প্রতিবাদী মতটি সোচ্চারে বলা হয়েছে – সেই একই ধরনের সামাজিক প্রবর্তনাতেও মধুসূদন ছিলেন নির্বিকার। শুধুমাত্র নাট্যক্রিয়ার উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন। যদিও মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনই 'একেই কি বলে সভ্যতা' বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, তবু সে বিষয়ে কোন শ্লোগান বা বক্তৃতা মধুসূদন করেননি। তার এই সংযমই প্রহসনটিকে উদ্দেশ্য মূলক নাটকের মলিনতা থেকে উপরে তুলে আনতে পেরেছিল।

'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকটিতে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বাস্তব প্রশ্ন ও প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। যেমন—

কর্তা।। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কাতা এ কলকাতা মহাপাপনগর কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?[৩]

-এই শ্রেণির লাম্পট্য ও অসংযত আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নাট্যকার যেন জানতে চেয়েছেন,

> *"বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমার সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল। মদ-মাংস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?"*[৪]

একই প্রশ্ন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেই যেন বনিত হয়েছিল সেদিন। আপন অভিজ্ঞতার মাধুরী মিশিয়ে নাট্যকার মধুসূদন যে সমাজে বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন তা স্বভাবতই ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণির মনপসন্দ হয়নি। ফলে

তারা নাটকটি বন্ধ করে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। ইতিপুর্বে রামনারায়ণের ক্ষেত্রেও তৎকালীন সমাজপতি কুলিন ব্রাহ্মণেরা কুলীন কুলসর্বস্বকে ভালো চোখে গ্রহণ করতে পারেননি। মধুসুদনের নাটকখানি যে সমাজের ভিতকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে নাটকটির প্রথম অভিনয়ের পর। বেশ কৌশলেই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় বন্ধ করা হয়।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মধুসূদন সেকালের পথভ্রষ্ট ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের ছবি এঁকেছিলেন- সে ছবি ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ- মাটির কাছাকাছি। প্রথমে আমরা ঘটনাক্রমটি বিস্তারিত করে নিতে পারি - নববাবু - কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। তার স্ত্রী হরকামিনী। নববাবু-ই এই নাটকের প্রধান চরিত্র - সে কয়েকজন ইয়ার নিয়ে কলকাতায় জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা স্থাপন করে সংস্কৃত চর্চার সাথে মদ্যপান এবং বারবণিতাসঙ্গ করে চলছেন। তার পিতা কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব,বেশিরভাগ সময় তিনি বৃন্দাবনেই বাস করেন। বর্তমানে ছেলের চালচলনে সন্দেহ করে কলকাতায় অবস্থান করছেন। পিতার চোখ এড়িয়ে নববাবু - জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যেতে পারছে না, একদিন বন্ধু কালীবাবুর সহায়তায় সে সভায় যেতে পারল। কিন্তু কর্তামহাশয় বৈরাগীকে পাঠালেন। বৈরাগীর মুখ বন্ধ রাখতে নববাবু ঘুষ দিলেন। কিন্তু রাত্রিতে মাতাল নববাবু বাড়ি ফিরলে সমস্তই প্রকাশিত হল। কর্তা মশায় কলকাতার বাস তুলে দেবার সংকল্প করলেন। সংক্ষেপে এই ঘটনা কাঠামোর মধ্যে নববাবু, নববাবুর বন্ধুবর্গ এবং পতিতালয়ের যে স্বাভাবিক চিত্র মধুসূদন এঁকেছেন, তা দর্পনে পূর্ণচন্দের প্রতিবিম্বই প্রদর্শন করে।

ইয়ং বেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি নববাবুর বক্তৃতার মাধ্যমেই আমরা তাদের মনোভাব স্পষ্ট করতে পারি-

> *"জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারস্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি। আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমা সকলে মাথা, মন এক করে এ দেশের সোশিয়াল রিফরমেশন যাতে হয়, তা চেষ্টা কর। ...জেন্টেলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এডুকেট কর - তাদের স্বাধীনতা দাও - তা হলে এবং কেবল তা হ'লেই আমাদের প্রিয় ভারত ভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে - নচেৎ নয়।"*[৫]

এবং শেষ পর্যন্ত 'লেট আস এঞ্জয় আওয়ারসেলভস্' বলে বক্তৃতা এবং বারবনিতা সঙ্গের দ্বারা সভার কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করলেন।

এত গেল বাড়ির বাইরের চিত্র, বাড়ির ভিতরের সামান্য নমুনা নবুবাবুদের চরিত্রকে পূর্ণবিম্বিত করবে। একদিন নববাবু মদ খেয়ে রাত করে বাড়ি ফিরে প্রাপ্তবয়স্ক বোনকে চুম্বন করলেন। এবং সাফাই দিয়ে বললেন - 'এতে দোষ কি? সাহেবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?' এহেন সব চিত্র ও সংলাপই পাঠককে বাদপ্রতিবাদের ক্ষেত্রেটি বুঝে নিতে সাহায্য করে। নাট্যকারকে বলে দিতে হয় মা, সোচ্চারে চরিত্রদেরকে এর প্রতিবাদও করতে হয় না।

এবার আমরা সামনে আনতে পারি (বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদত্ত নামকরণ) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকটিকে। 'একেই বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' শুধুমাত্র একই বছরে রচিতই নয়, বিষয়ও একই ধরনের। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে - একে অপরের পরিপূরক, যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। কাহিনির মূলে

রয়েছে প্রজাপীড়ক জমিদার ভক্তপ্রসাদ। হানিফ নামে এক দরিদ্র প্রজা তার খাজনা পুরো সুদ করতে পারছে না। ভক্তপ্রসাদও ছাড়বার পাত্র নন। হানিফ – জমিদারের অনুচর গদাধরকে ধরল, গদাধর জমিদারকে হানিফের নতুন স্ত্রীর কথা বললে কামাসক্ত ভক্তপ্রসাদ হানিফের খাজনা মাফ করে দেন। এরপর হানিফের স্ত্রী ফতিমার কাছে পুঁটির মাধ্যমে প্রস্তাব গেল, স্বাভাবিক ভাবেই সেকথা সরলপ্রাণা ফতিমার কাছ থেকে হানিফ জানতে পারে। আবার ক্রুদ্ধ হানিফের কাছ থেকে বাচস্পতি জানতে পারে। বাচস্পতি এবং হানিফের পরিকল্পনায় রাত্রিকালে পুঁটির সঙ্গে ফতিমা যায় নির্জন শিবমন্দিরে। সেখানে ভক্ত প্রসাদ আসে গদার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত হাতে নাতে ধরা পড়ে উপযুক্ত শিক্ষা পায়। প্রহসনচিত লঘু হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে সত্যের প্রকাশে মধুসূদন সফল। এবারে আমরা দেখে নিতে চাই প্রতিবাদ কিভাবে আকার নিয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের কিছুটা  অংশ উল্লেখ করলেই সে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হানি। আমার সামনে্ যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ, হানিফ্‌, অমন রাগলে চলব্যে না, তাহলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্‌।

হানি। আরে থোও ম্যানে ঠাহুর! আমার লহু গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্‌ কত্তেছে, - একবার শালারে এখন পালি হয়, তাহলি মনের সাধে তারে কিল্‌য়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি?...

(উভয়ের প্রস্থান) ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ...

ফতে। তুই নৈলে থাক্‌ ভাই। মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্‌, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়; আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাইনে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস কেন? সে এমন করে জান্‌তে পারবে বল; সে কি এখানে দেখতে আসছে? তা এতো ভ্যই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম রাম! রাম!

রাম! (ফতেকে ধারণ)...

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ)

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হানফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

*ময়ূর চকোর শুক চাকতে না পায়।*
*হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।।*

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো! - আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা ছাইতে কি আগুন এত কাল ও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ কর্ না কেন?
পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোরে পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?- তুমি, আমার প্রাণ - তুমি আমার কলিজে - তুমি আমার চোদ্দো পুরুষ!

*তুমি প্রাণ, তুমি ধন তুমি মন, তুমি জন,*
*নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।*
*যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,*
*ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।।*

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর প্রাণ থাক্বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিতভাবে) অ্যাঁ - মন্দিরের মধ্যে? হাঁ তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই; তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?
নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দিকে দেখিয়ে) অ্যাঁ - আ - আ - আ - আমি না! ও বাবা! একি? কোথা যাব!

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম রাম রাম রাম। আমি তখনি ত জানি - রাম - রাম - রাম ।
ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না!

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে-

(নেপথ্যে হুঙ্কার - বনি।)

পুঁটি। ই-ই-ই-ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

ভক্ত। রাধাশ্যাম - রাধাশ্যাম! - ও মা গো - কি হবে!

(নেপথ্যে।) এই দ্যাখ্ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কছু জানি না, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেতাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদ প্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁ আঁ আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ - "মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে" এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুনের কাছে ভূত আসতে পার না!

(পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। এ কি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন!

-হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়ে গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও ? বাচ্পোৎ দাদা না কি? আঃ, ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। ( চেতন পাইয়া) রাম রাম রাম রাম!

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্লে অনেক রোজগার হবে! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্চাজ্জি মোসাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন দেখি ব্যাপারটাই কি? আপ্নিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখছি হানিফ্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই তুমি তো সকলি বুঝেছো, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম করেছিলেম, তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যা দেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্ছি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড়ো বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়বে। তুমি ভাই আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্বো।

বাচ। সে কি কত্তবাবু? আপনি হলেন বড় মানুষ - রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্তুটুকু যাওয়া অবধি দিবান্তেও অন্ন যোটা ভার তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?-

ভক্ত। হয়েছে- হয়েছে ভাই। আমি কল্যি তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো। আর দেখো, দেখো, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরো পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্মটি কর্য্যো যেন আজকের কথাটি কোনোরূপে প্রকাশ না হয়।...

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুলভাবে) এ কি! অ্যাঁ। এ আবার কি সর্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরের দিকি পুঁটির সাতে অ্যায়েছে, তাই তারে ঢঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জানতি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, এর চায়েও সোনার চাঁদ আপনার আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতুক অত্যাচার করেছিলে, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন; এখন আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন; এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতে পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে। ...

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন , কত্তাবাবু? - নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগী তোর জন্যই তো আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি কত্তাবাবু?- এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও!

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্ত প্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।[৬]

মধুসূদনের নাটক দুটিতে ইয়ং বেঙ্গলের মাতলামি বা কামুক জমিদারদের লাম্পট্য সবই জলছবির মত পরিষ্কার মনে হয়। কিন্তু কোনটা খারাপ বা কোনটা উচিত সে কথা নাট্যমধ্যে কোথাও উচ্চারিত হয়নি। আথচ এ নাটক দুটির অভিনয় হতে দেওয়া হয়নি। তাই সোচ্চার না হয়েও মধুসূদন এ নাটকের ভাষায় যে নির্মম তীক্ষ্ণতা এনেছেন, তার বিদ্যুৎ ঝলকই এ নাটকের প্রধান প্রতিবাদী বৈশিষ্ট। যে প্রতিশ্রুতি তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালা থেকে পেয়েছিলেন - সে প্রতিশ্রুতি তারা রাখতে পারেনি।

এর "সুন্দর বিবরণ পাই বেলগাছিয়া নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় -

> *"a few of the Young Bengal Class getting a scent of the farce and feeling that a caricature made in it touch them too closely, raised a hue and cry; and choosing for their leader a gentleman of position and influence who, they knew, had influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the board of their theatre. This gentleman (also a Young Bengal) fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce."*[৭]

আবার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকটি যাঁরা ছেপেছিলেন - সেই পাইকপাড়ার রাজারাই এর অভিনয় বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' তে কি কারণে বিরোধিতা নামে তা দেখি।

> *"স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভক্তপ্রসাদ সম্পর্কিত উক্ত পরিকল্পনাকে অসম্ভব বলিয়া মধুসূদনের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান আপত্তি হইয়াছে, 'গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনী-সংযোগে কখনোই ওরূপ ব্যগ্র হন না।' কিন্তু ইহা সত্য নয়। লম্পটের নিকট জাতিভ্রংশকর বলিয়া কিছু নাই। ভক্তপ্রসাদের মত ভণ্ডের একটি চরম পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্যই মধুসূদন এখানে তাহার সম্পর্কে মুসলমান কৃষক- রমণীর কথা আনিয়াছেন; ইন্দ্রিয় পরবশ ব্যাক্তির কোনপ্রকার ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না, অতএব এই চরিত্রটির স্বাভাবিকতায় সন্দিগ্ধ ইহবার কোন কারণ নাই। বিগত শতাব্দীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিতেন; মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার এই মনোভাবের বিরোধী ছিল বলিয়াই, তিনি এখানে নির্বিচারে এই মুসলাম কৃষক-নারীর চরিত্রটি আনিয়া যোগ করিয়াছেন। ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্যের চরম অবস্থা বর্ণনা করিবার পক্ষে এখানে এই চরিত্রটি নিঃসন্দেহে পরম সহায়ক হইয়াছে বলিতে হইবে।"*[৮]

সমাজের ঘটমান বিষয়বস্তুর মধ্যে ভণ্ডামির উপস্থাপন তাকেই শুধু সামনে এনে মধুসূদন পেয়েছেন অবহেলা - তাই বিরক্ত মধু লেখেন -

> *"Mind you broke my wings about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali, and books in Hebrew or Chinese"*[৯]

কিন্তু যাই হোক না কেন, চাপের কাছে নতিস্বীকার করে বাংলায় প্রথম কোন নাটকের অভিনয় বন্ধ হল। সেই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকলো এদুটি প্রহসন এবং তার রচিয়তা - মধুসুদন দত্ত।

**তথ্যসূত্র :**

১. ড. অজিত কুমার ঘোষ - বাংলা নাটকের ইতিহাস, ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ-৫৫
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৫, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ-১৪৮
৩. মধুসূদন দত্ত, একেই কি বলে সভ্যতা, তপন মণ্ডল - মধুসূদনের প্রহসন কালের দর্পণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, পৃ-১৪৫

৪. তদেব, পৃ ১৪৬

৫. তদেব, পৃ ১৪০

৬. মধুসূদন দত্ত, বুড়ো শালিকের ঘারে রো, তপন মণ্ডল - মধুসূদনের প্রহসন কালের দর্পণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, পৃ-১৬২-৬৭

৭. কেশবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা, তপন মণ্ডল - মধুসূদনের প্রহসন কালের দর্পণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, পৃ-১৪৫

৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৫, এ মুখার্জী আণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ-২২৩

৯. মধুসূদনের পাত্র, তপন মণ্ডল - মধুসূদনের প্রহসন কালের দর্পণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, পৃ-১৪৭